# নড়াইলের বিছালী অপরাধীদের অভয়ারণ্য

লিখেছেন নড়াইল থেকে **মামুন রহমান**

৩০ নবেম্বর। নড়াইল সদর থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরের গ্রাম বিছালীতে পৌঁছুলেই রাস্তার মোড়ে জনতার জটলা চোখে পড়ে। সবাই কোনো একটা বিষয় নিয়ে কানাঘুষা করছে। তার মধ্যে একটা কথাই বেশি উচ্চারিত হচ্ছে, 'এসব পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হলে জলজ্যান্ত একটা সুস্থ মানুষ হঠাৎ করেই কেন এমন পাগল হয়ে যাবে! আর হলেই বা আশপাশে এত জায়গা থাকতে সে কেন নাওসানা শ্মশানে গিয়ে রাত কাটাবে?'

লোকটির নাম হাজের আলী (৫৫)। বিছালী গ্রামেই তার বাড়ি। এই হাজের আলীই হঠাৎ করে পাগল হয়ে যায়। আর গ্রাম ছেড়ে সে রাতের বেলায় থাকতে শুরু করে গ্রামের শেষ প্রান্তে অবস্থিত বিশাল বিলের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত 'ভয়ঙ্কর' স্থান হিসেবে পরিচিত নাওসানা শ্মশানে। রাত তো দূরের কথা, দিনের বেলাতেও যেখানে মানুষ যেতে ভয় পায়। ঐ এলাকায় বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এখানেই তাদের মারা যাওয়া স্বজনদের সৎকার করে থাকেন। যে কারণে নাওসানা শ্মশান নিয়ে ঐ এলাকার মানুষ সব সময় আতঙ্কে থাকেন। অবশ্য এ আতঙ্কের পেছনে আরো একটি বর্বর ঘটনা জড়িত রয়েছে। যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল হাজের আলী। সে কারণেই সবার ধারণা, সেই পাপের কারণেই হাজের আলী পাগল হয়ে গেছে। সেই পাপই তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর স্থান নাওসানা শ্মশানে। কি সেই পাপ?

**নেপথ্য কথা :** ১৯৭৩ সালের কথা। বিছালী গ্রামে ছিল নায়েব বাহিনী নামে একটি ভয়ঙ্কর বাহিনী। সাধারণ মানুষের কাছে যারা ছিল মূর্তিমান আতঙ্ক। ঐ নায়েব বাহিনী প্রধান নায়েবের অন্যতম দেহরক্ষী ছিল একই গ্রামের নিজাম উদ্দিন সরদার। আর হাজের আলী ছিল ঐ বাহিনীর সক্রিয় সদস্য। কিন্তু বাহিনী প্রধান নায়েবের সঙ্গে দেহরক্ষী নিজাম দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়লে নায়েব বাহিনী তাকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর হাজের আলীসহ অন্যান্যরা তার লাশ নাওসানা শ্মশানের বরুইতলায় পুঁতে রাখে। এ ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে প্রথমবারের মতো এলাকার মানুষ ফুঁসে ওঠে। তারা নায়েবের বাড়ি ঘেরাও করে এর জবাব চায়। বিশেষ করে মুসলমানের লাশ শ্মশানে দেয়া হল কেন তার কৈফিয়ত চায়। এতে ভয়ঙ্কর নায়েব আরো রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। হুমকি দেয়, এ নিয়ে আর কেউ যদি টুশব্দটি করে তাহলে তার বুক ঝাঁঝরা করে দেয়া হবে। ধড়ে মাথা থাকবে না। প্রাণের ভয়ে বিষয়টি নিয়ে আর কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। নায়েবকেও আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ঐ এলাকার অন্তত ৮টি ইউনিয়নের মুকুটহীন সম্রাট বনে যান তিনি। তার আদেশ-নির্দেশই ছিল সেখানে আইন।

**নায়েবের উত্থান-পতন :** নায়েবের পুরো নাম ছিল তোরাব আলী ফকির। সেটেলমেন্ট বিভাগে কাজ করার সুবাদে নায়েব জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে অনেকটা ভূস্বামী বনে যান। অগাধ অর্থবিত্তের পাশাপাশি তিনি একটি বাহিনীও গড়ে তোলেন। সদ্য স্বাধীন একটি দেশের প্রশাসনিক দুর্বলতার শত ভাগ সুযোগ নিয়ে তিনিই বনে যান অনেকটা ঐ অঞ্চলের 'রাজা'। আর এক পর্যায়ে কৌশলে

*বিছালী বটতলা: এখানে অনেককেই হত্যা করা হয়েছে*

*নিহত আবু বকরের পরিবার*

জনসমর্থনটিও তিনি হাসিল করে নেন।

অনেক পুরনো ঘটনা হওয়ায় গ্রামের সাধারণ মানুষ সঠিকভাবে দিন-তারিখ বলতে পারেননি। তবে '৭৪ সালের কোনো এক সময়ে যশোরের অভয়নগর থানার মথুরাপুর গ্রামের ৪ ডাকাত শহীদ, আনোয়ার, আকুল ও আবেদ ডাকাতি করার সময় ধরা পড়ে। ঐ ৪ ডাকাতকে ধরে নায়েব বিছালী বটতলায় সালিশ বসায়। এবং তাদের ওপর সাধারণ মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি করে মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করে। গ্রামের সহজ সরল-মানুষ নায়েবের কথায় হাততালি দিয়ে সে রায়ে সমর্থন জানায়। এরপর বটতলাতেই ৪ ডাকাতকে বেদম প্রহার করা হয়। এরপর তাদেরকে একসঙ্গে জীবন্ত মাটিচাপা দেয়া হয় বিছালী বিলের পাশে। এ ঘটনার কিছুদিন পর নায়েব বাহিনী পার্শ্ববর্তী চকোই গ্রামের সমেজ মোল্লাকে গুলি করে হত্যা করে। এভাবে নায়েব বাহিনী পর্যায়ক্রমে গুলি, জবাই ও পিটিয়ে হত্যা করে চকোই গ্রামে প্রভাবশালী ব্যক্তি জহুর শেখ, ভবানীপুর গ্রামের লুৎফর রহমানসহ ঐ এলাকার ওমর মল্লিক, সোহরাব মল্লিক, আকঞ্জি সাহেব, সোনাউল্লাহ, জোনাব শেখ, সালাম গাজী, পরশ উল্লাহ ও ইমাম গোলদারকে। এভাবে একের পর এক হত্যাকান্ড ঘটাতে ঘটাতে নায়েব বাহিনীই ঐ এলাকার দন্ডমুন্ডের মালিক হয়ে যায়। তাদের আদেশ-নির্দেশই আইনে পরিণত হয়। তারা যাকে খুশি শাসন, শোষণ এবং হত্যা করে। নায়েব বাহিনীর বিচারে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে বর্তমানে আকদিয়া গ্রামে বসবাসরত আব্দুর রশিদ ছাড়া আর কেউ বাঁচতে পারেনি। গ্রামবাসী বলেছেন, দেশ স্বাধীনের পর নায়েব বাহিনী রশিদকে রাজাকার আখ্যায়িত করে তাকে ধরে আনে। এরপর নায়েবের বাড়ির সামনে কথিত সালিশ বসানো হয়। সেখানে তার মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করা হয়। এরপর রশিদের চুল, দাড়ি কামিয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে বেদম প্রহার করা হয়। নায়েব বাহিনী যতবার রশিদকে প্রহার করে সে ততবার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে। পরদিন সকালে রশিদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার কথা ছিল। কিন্তু অলৌকিকভাবে ঐ রাতে সে পালিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও নায়েব বাহিনী তার হদিস পায়নি।

বিছালী গ্রামের বাকা হাজারী বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর বাকা হাজারী খুন হলে নায়েব এর দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় তার স্ত্রীর ওপর। এরপর তাকে ধরে এনে বস্তার মধ্যে ভরে অমানুষিকভাবে প্রহার করে। মোটামুটি গোটা এলাকা থেকে নায়েবের প্রতিপক্ষদের সরানোর পর নায়েব ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। প্রকাশ্যে ছাড়া তার বাহিনী যে সমস্ত হত্যাকান্ড ঘটায় তার দায়দায়িত্ব নায়েব চাপিয়ে দেয়

*মির্জাপুর ফুটবল মাঠ: ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করা হয় ৪ জনকে*

'কমিউনিস্ট'দের ওপর। এলাকার মানুষের কাছে ভালো সাজতে এরপর প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় আর একজন মুসলমান খুন হলে সেই দিন প্রথম যে ৭ জন হিন্দুকে সামনে পাওয়া যাবে তাদের মাথা কেটে নেয়া হবে। উল্লেখ্য, নায়েব ও তার বাহিনীর লোকজন ঐ এলাকার মানুষের মনে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে, ঐ এলাকায় যে সমস্ত গুপ্ত হত্যাকান্ড ঘটছে তার সবই ঘটাচ্ছে কমিউনিস্টরা। আর নেপথ্যে তাদের সহায়তা করছে হিন্দুরা। এরপর তিনি বলেছিলেন, কে জানে না কালিপদ কমিউনিস্ট...। নায়েবের এ দম্ভোক্তির পর আর বেশিদিন সাম্রাজ্য চালানো সম্ভব হয়নি তার। এর কিছুদিন পরেই আকোবপুর গ্রামে নকশালরা তাকে গুলি করে হত্যা করে। ঐ দিন নায়েব তার এক হিন্দু বাল্যবন্ধুর বাসায় গেলে সশস্ত্র নকশালরা সেখানে তাকে ঘিরে ফেলে। ঐ সময় নায়েবের হিন্দু বন্ধু তাকে জড়িয়ে ধরে হত্যা না করার জন্যে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেও নকশালরা তাকে ক্ষমা করেনি। বরং নায়েবকে ছেড়ে তার বন্ধুকে সরে যেতে বললে তিনি তা না করায় নকশালরা দু'জনকেই একসঙ্গে গুলি করে হত্যা করে। এর সঙ্গে সঙ্গে অবসান ঘটে নায়েবের দীর্ঘ কুকর্মময় জীবনের এবং তার বাহিনীর এ ঘটনা ১৯৭৬ সালের। নায়েবের পতনের পর স্বাভাবিকভাবে তার বাহিনীও কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, নায়েবের পতনের পর পিতার পথ অনুসরণ করে তার পুত্ররা। তারা নিজেরাই গড়ে তোলে একটি বিশাল বাহিনী। যে বাহিনীর কার্যক্রম কোনো অংশেই কম ছিল না নায়েব বাহিনীর তুলনায়। তারা যখন যা খুশি তাই করেছে। প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করলেও বাস্তবে তারা করতো বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি। আর তাদের প্রতিপক্ষ ছিল সর্বহারা পার্টি। পূর্ব রেষারেষির এক পর্যায়ে (১৯৮৬ সালে) মির্জাপুর বাজারে সমির দাসকে চরমপন্থিরা গুলি করে হত্যা করলে নতুন করে আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ঐ এলাকা। এ খুনের বদলা হিসেবে সর্বহারারা হত্যা করে মির্জাপুর গ্রামের মহব্বতকে। মহব্বত তাদের এলাকায় তৎপর চরমপন্থিদের ব্যাপারে নড়াইল থানা পুলিশকে জানিয়ে বাড়ি ফিরছিলো। সিঙ্গিয়া বাজারের কাছে পৌঁছলে প্রতিপক্ষ গ্রুপ তাকে অপহরণ করে সারা শরীরের হাড়গোড় পিটিয়ে ভেঙে দেয়। এ অবস্থায় সে মারা যায়। এরপর ১৯৯৩ সালের ৮ জানুয়ারি যশোর-নড়াইলের সীমান্তঘেঁষা চকোই গ্রামে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি ও সর্বহারাদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে সর্বহারাদের নয়জন নিহত হয়। যাদের মধ্যে রাজকুমার, আকবর, জুয়েল ও ইমরানের পরিচয় পাওয়া যায়। এ যুদ্ধে সর্বহারাদের ভরাডুবির ফলে তারা এলাকা ছেড়ে চলে যায়। যে কারণে একক রাজত্ব কায়েম করে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি। সেই সঙ্গে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে নায়েবের ছেলে মশিয়ার, বুলবুল, খোকনসহ তাদের সাঙ্গপাঙ্গরাও। তাদের ভয়ে এলাকা ছাড়ে প্রতিবাদী লোক হিসেবে পরিচিত মানিক কাজীও। শোনা যায়, মানিক কাজীর সঙ্গে সর্বহারাদের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু '৯২ সালে সর্বহারাদের ঐ এলাকায় পতন ঘটলে তিনিও ক্ষমতাহীন হয়ে যান এবং আত্মগোপন করেন। এরপর প্রায় ৫ বছর আত্মগোপন করে থাকার পর মানিক কাজী নায়েবের ছেলেদের সঙ্গে আপোস করে এলাকায় ফিরে আসেন। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারেননি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে রহিমা খাতুনের নিবেদন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া,

শ্রদ্ধেয় দেশনেত্রী,

১৯৯৭ সালের ২৯ জুলাই মির্জাপুর ফুটবল মাঠ থেকে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র ক্যাডাররা তাকে হাজার হাজার মানুষের সামনে থেকে ধরে নিয়ে যায়। ঐ সময় সেখানে একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা চলছিল। বিপ্লবীরা মানিক কাজীকে অপহরণ করার চেষ্টা করলে সেখানে সমবেতরা বাধা দিলে চরমপন্থিরা তাদের লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করে। ফলে সেখানে নিহত হয় নিরীহ ৪ দর্শক হালিম, মাহবুব, হান্নান ও ওলিয়ার। এরপর চরমপন্থিরা মানিক কাজীকে ধরে নিয়ে ঐ এলাকার বনখলিশাখালী গ্রামে নিয়ে বেঁধে রেখে খাসি জবাই করে খানাপিনা করে। এরপর রাতে তাকে হত্যা করে লাশ পুঁতে রাখে ভয়ঙ্কর শ্মশান নাওসানায়। এ ঘটনায় নায়েবের ৩ ছেলে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এদের মধ্যে একজনকে আসামিও করা হয়, কিন্তু চার্জশিট থেকে তার নাম বাদ যায়। অভিযোগ রয়েছে এ হত্যাকান্ডটি ঘটানো হয় ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের আগে। ঐ নির্বাচনে মানিক কাজী, নায়েবের ছেলে মশিয়ার রহমান এবং মানিক কাজীর প্রধান প্রতিপক্ষ বাবর আলী শেখ প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন। নির্বাচনকে সামনে রেখে নায়েবপুত্ররা এক ঢিলে ৩ পাখি মারে। তা হলো, মানিক কাজী খুন হওয়ার পর তার প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে বাবর আলীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ফলে নায়েবপুত্র মশিয়ার ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে চেয়ারম্যান বনে যান। পাশাপাশি পথের দুই কাঁটাও সাফ হয়ে যায়।

নায়েবপুত্রদের বর্বরতা ও হিংস্রতা এখানেই শেষ নয়। এর আগে ১৯৮৮ সালে নায়েবপুত্র খোকন নওয়াপাড়ার বিনোদন সিনেমা হলের সামনে অভয়নগর থানা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সরোয়ার জাহান স্বপনকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে বলে অভিযোগ ওঠে। এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে মামলাও হয়, কিন্তু ভয়ে তার বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষী দিতে পারেনি। বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতা বশির উদ্দিন স্বপনের পরিবার এবং সাক্ষীদের চাপ দিয়ে বিষয়টি মীমাংসা করিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলে আর কেউ খোকনের বিচার চাওয়ার সাহস পায়নি। এই খোকনই ১৯৮৬ সালে অভয়নগর থানার শংকরপুর গ্রাম থেকে আপন দুই বোনকে অপহরণ করে ধর্ষণ করে একজনকে হত্যা করেছিল। এ ঘটনায় খোকন ৩/৪ বছর জেলও খাটে। এরপর ১৯৯৯ সালের এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডাররা প্রকাশ্য দিবালোকে শত শত মানুষের সামনে নওয়াপাড়া খেয়াঘাটে আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যক্ষ আব্দুল ওহাবকে স্ত্রী-কন্যার সামনে গুলি করে হত্যার চেষ্টা চালায়। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে শেষ পর্যন্ত অধ্যক্ষ ওহাব বেঁচে যান। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ নায়েবপুত্র বুলবুল এবং বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জসিমকে গ্রেপ্তার করে। পরে তারা পুলিশের কাছে স্বীকার করে পার্টির সিদ্ধান্তেই তাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনা হয় নায়েবের অপর পুত্র এবং বিছালী ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান মশিয়ার রহমানের যশোরস্থ খালধার রোডের বাড়িতে। এ ঘটনায় অন্য আসামিরা কারাগারে থাকলেও চেয়ারম্যানের ভ্রাতা বুলবুল ঠিকই জামিনে ছাড়া পেয়েছে।

১৯৯৫ সালে বিপ্লবীরা মালাধরা গ্রামের বলিষ্ঠ ব্যক্তি শামছু কাজীকে গলা থেকে নাভি পর্যন্ত ফেড়ে ফেলে হত্যা করে। শামছু কাজীর সঙ্গে সর্বহারাদের সুসম্পর্ক ছিল। ভয়াবহ এই ঘটনাটি ঘটলে শামছু কাজীর লোকজন কোবরা গ্রামের কুস্তিগীর ও ডাকাত হিসেবে পরিচিত আব্দুল জব্বারকে ধরে এনে বিছালী বটতলায় পিটিয়ে হত্যা করে। হত্যার আগে পিটিয়ে তাকে স্বীকার করতে বাধ্য করা হয় যে, সে-ই শামছু কাজীকে হত্যা করেছে। কিন্তু এ ঘটনার ক'দিন পর ঐ গ্রামের বারিক সরদারের ছেলে শুকুর অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যায়। মারা যাওয়ার সময় সে স্বীকার করে যায়, জব্বার নয়, শামছু কাজীকে সে-ই হত্যা করেছিল।

এর আগে ১৯৮০ সালে বিছালী গ্রামে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হয় ধনাঢ্য ব্যক্তি আবু বক্কর। বাড়ি থেকে ধরে এনে বড়াল গ্রামে নিয়ে দ্বিখন্ডিত করে তাকে হত্যা করা হয়। এরপর তার বিশাল সম্পত্তি দুর্বৃত্তরা জবর দখল করে নেয়।

এভাবে অসংখ্য বর্বর ঘটনা ঘটেছে যশোর-নড়াইলের সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত বিছালী ইউনিয়নে। গ্রামবাসীর মতে, বাংলাদেশের আর কোনো ইউনিয়নে এত বর্বর ঘটনা ঘটেছে বলে তাদের জানা নেই। কিন্তু অবাস্তব হলেও সত্য, এ সমস্ত ঘটনার জন্য কারো সাজা হয়নি। সিংহভাগ ঘটনার কোনো মামলাও হয়নি। এমনকি হয়নি কোনো তদন্তও। আর এখনো তারা শান্তি বা স্বস্তিতে নেই। অপরাধীরা আগের মতোই এলাকায় কিলবিল করছে। একই ইউনিয়নে দু'দুটো পুলিশ ফাঁড়ি বসানো সত্ত্বেও দুর্বৃত্তদের দমন করা যাচ্ছে না। বরং সময় সুযোগ পেলে তারা উল্টো পুলিশের ওপর হামলা করছে। আওয়ামী লীগ শাসনামলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যে অতিরিক্ত ১৫০টি পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হয় তার মধ্যে বিছালী পুলিশ ফাঁড়ি অন্যতম। ১৯৯৯ সালে দুর্বৃত্তরা এই ফাঁড়িতেই আক্রমণ করে। পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ হয় তাদের। কিন্তু অসংখ্য হত্যাকান্ডের মতো এ ঘটনাটিরও কোনো সুরাহা হয়নি। এলাকার সাধারণ মানুষ এসব ঘটনার সুরাহা চান। এর জন্য চান প্রশাসনিক সহায়তা, কিন্তু তাও তারা পাচ্ছেন না।

ইউপি সদস্য রহিমা খাতুন ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বরাবর স্মারকলিপিও দিয়েছেন। কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখন বিছালীর শান্তিপ্রিয় মানুষের একটাই জিজ্ঞাসা– তাহলে তারা কি আজীবন অন্ধকার যুগেই থেকে যাবে? তাদেরকে উদ্ধার করার কোনো উপায় কি নেই?